'সাধনা' বক্তৃতামালার চতুর্থ অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তির আত্মসমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। যে-কোনো ব্যক্তির অস্তিত্বের একটি প্রান্তে সে অচেতন ও নিষ্প্রাণ বস্তুর সঙ্গে অভিন্ন। সেখানে তাকে বিশ্ববিধান মেনে চলতে হয়। এখানেই অত্যন্ত গভীরে রয়েছে তার অস্তিত্বের ভিত্তি; এভাবেই পৃথিবীর সঙ্গে একটি সুদৃঢ় সম্পর্কে গ্রথিত হয়ে সে সকল বস্তুর সঙ্গে একাত্মবোধ করে।

কিন্তু তার অস্তিত্বের অন্য প্রান্তে সে সকলের থেকে পৃথক, সেখানে সে এক স্বতন্ত্র ব্যক্তি। সেখানে সে সম্পূর্ণরূপে বিশিষ্ট এবং তুলনাহীন, সকল বস্তুর সঙ্গে মিলিত হওয়ার আকর্ষণ সত্ত্বেও সে তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। যদিও তা খুবই সামান্যরূপে প্রতীয়মান হয় কিন্তু প্রকৃতই তা অসামান্য। সে সে-সকল শক্তির বিরুদ্ধে আপন সত্তাকে ধরে রাখে যে-সব শক্তি তার বৈশিষ্ট্যকে হরণ করে তাকে অবলুপ্তির পথে নিয়ে যায়।

ব্যক্তিসত্তার এই উপরিকাঠামো উন্মুক্ত হয় এক অনির্দিষ্ট গভীর অন্ধকার থেকে। তার একাকিত্বে সে গর্বিত কারণ সে স্রষ্টার একটি ভাবের রূপ, বিশ্বে যার আর প্রতিরূপ নেই। এই ব্যক্তিসত্তার স্বাতন্ত্র্য নাশ হলে তার মধ্যে সৃষ্টির আনন্দ যে সুনির্দিষ্ট রূপ পেয়েছিল তা মুছে যাবে। সত্তার এটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য যা হারিয়ে গেলে সমগ্র বিশ্ব ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এ সর্বজনীন নয় বলে এ আমাদের কাছে মূল্যবান। মানবকণ্ঠে তাই গীত হয় এই গান —

মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল-মাঝে
আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে, ভ্রমি বিস্ময়ে।।

(পৃ. ১৪০)

এই মানব বিশ্বজগৎকে দেখে বিস্মিত এবং তার ব্যক্তিসত্তার ভেতর দিয়ে সত্যভাবে বিশ্বকে লাভ করতে পারে। আমাদের কাছে বিশ্ব অজানাই থেকে যেত যদি আমরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ভুলে বিশ্বের বুকে অচেতন হয়ে থাকতাম। আমাদের অনন্যতা বজায় রাখার এই যে ইচ্ছা তা বিশ্বেরই আকাঙ্ক্ষা যা আমাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল। জানার মাঝে অজানাকে উপলব্ধি করার যে আনন্দ তা নিজেকে নিজের মধ্যে খুঁজে পাওয়ার আনন্দ।

মানুষ তার ব্যক্তিসত্তার বিচ্ছিন্নতাকে এক বহুমূল্য সম্পদ বলে মনে করে। একে রক্ষা করার জন্য সে যন্ত্রণা ভোগ করে ও পাপকর্মে লিপ্ত হয়। তার অন্যত্ব সম্বন্ধে তার সচেতনতা এসেছে জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণ করার পর। তার স্বাতন্ত্র্যবোধ তার কাছে অত্যন্ত প্রিয় যদিও এই অবস্থায় পৌঁছোতে তাকে লজ্জা, পাপ ও মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করে নিতে হয়েছে। অথচ সে প্রকৃতির কোলে অজ্ঞান ও জড় অবস্থায় কাটিয়ে স্বর্গসুখ উপভোগ করতে পারত। এই পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রাখতে তাকে ক্রমাগত দুঃখভোগের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করাতেই রয়েছে এর মূল্যের পরিমাপ। এই মূল্যের একদিকে রয়েছে মানুষের ত্যাগ ও অন্যদিকে রয়েছে তার প্রাপ্তি। ব্যক্তিসত্তার তাৎপর্য বলতে যদি আর কিছু না হয়ে শুধু দুঃখ ও ত্যাগ বোঝাত তা হলে মানুষ হয়তো কখনোই স্বেচ্ছায় ত্যাগ স্বীকার করত না। এই কারণবশত তা তার কাছে মূল্যহীন হয়ে উঠত যদি না সে আত্মবিলুপ্তিকে তার চরম লক্ষ্য বলে মনে করত।

মানুষ তার জীবনে পদে পদে দুঃখ ও যন্ত্রণা ভোগ করে। রবীন্দ্রসংগীতে তাই শুনি —

> কতবার যে নিবল বাতি, গর্জে এল ঝড়ের রাতি —
> সংসারের এই দোলায় দিলে সংশয়েরই ঠেলা।।
> বারে বারে বাঁধ ভাঙিয়া বন্যা ছুটেছে।
> দারুণ দিনে দিকে দিকে কান্না উঠেছে।
>
> (পৃ. ১০৩)

কিন্তু এই দুঃখ বা যন্ত্রণা ভোগের মধ্য দিয়ে মানুষের কাছে তার জীবন আরও মূল্যবান হয়ে উঠে তাকে পূর্ণতা দেয়। এর ভেতর দিয়েই তার ব্যক্তিসত্তার ইতিবাচক দিকটি উপলব্ধি করায় সে নির্দ্বিধায় ত্যাগ স্বীকার করে।

রবীন্দ্রনাথের কোনো শ্রোতা তাঁর কাছে জানতে আগ্রহী হন যে ভারতীয়দের কাছে আত্মবিলুপ্তি কি চরম লক্ষ্য নয়?

রবীন্দ্রনাথ এর উত্তরে বলেন যে মানুষ কখনো আক্ষরিক অর্থে তার ভাবনা প্রকাশ করে না, যদি না তা অত্যন্ত সাধারণ কোনো ব্যাপার হয়। গভীর কোনো ভাবনা চিন্তাকে প্রকাশ করতে হলে মানুষের ভাষাকে জীবনের পরিপ্রেক্ষিত থেকে ব্যাখ্যা করতে হয়। বৌদ্ধ, ভারতীয় ও খ্রিস্টধর্মে নিঃস্বার্থ হওয়ার উপরেই জোর দেওয়া হয়, সেখানে কখনোই আত্মবিলুপ্তির কথা বলা হয় না। খ্রিস্টধর্মে অসার

জীবন থেকে মানুষের মুক্তি পাওয়ার যে ধারণা তা মৃত্যুর প্রতীক দিয়ে বোঝানো হয়েছে। বৌদ্ধধর্মে নির্বাণ লাভ করাও সমার্থক, দীপ নির্বাপিত হওয়া যার প্রতীক।

তবে ভারতীয় ভাবনায় মানুষের যথার্থ মুক্তি হল তার অবিদ্যা বা অজ্ঞানতার থেকে মুক্তি। যা-কিছু ইতিবাচক ও অকৃত্রিম তার বিনাশ নেই। যা নেতিবাচক এবং যা আমাদের সত্যদর্শনকে বাধাপ্রাপ্ত করে তা বিনষ্ট হয়। তবে ব্যক্তিসত্তাকে সত্য হিসাবে ভেবে নেওয়া আমাদের অজ্ঞতা এবং তখন আমরা এমনভাবে বাঁচি যে ব্যক্তিসত্তা হয়ে ওঠে আমাদের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্যবস্তু। মানুষের সত্তা কখনো একই পরিস্থিতিতে আবদ্ধ থাকে না, এগিয়ে চলাই হচ্ছে তার স্বভাব। শৃঙ্খলবদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে আমরা অবিদ্যা দূর করতে বাধ্য এবং তখন মানুষের মন তার অন্তর্ব্যাপ্ত ভাবনার জগতে মুক্তি পায়। পূর্ণ জ্ঞান লাভ করলে প্রত্যেকটি শব্দকে যথার্থ ভাবে জানি এবং তা মানুষের চিন্তাকে বদ্ধ করতে পারে না।

অবিদ্যা যখন মানুষকে এভাবে চিন্তা করতে বাধ্য করে যে ব্যক্তিসত্তাই তার শেষ কথা তখন মানুষের মধ্যে সীমাকে অতিক্রম করে যাওয়ার যে প্রবণতা আছে তাকে উপলব্ধি করতে সে ব্যর্থ হয়। তাই মানুষের আত্মবোধের অর্থ হচ্ছে আত্মাকে যথার্থভাবে জেনে মুক্তিলাভ করা, এমনই মত পোষণ করতেন জ্ঞানীরা। আমরা আমাদের স্বভাবকে তার স্বরূপে জেনেই মুক্ত হই।

'আরোগ্য' কাব্যগ্রন্থের ৩৩-সংখ্যক কবিতা কবির এই ভাবনাই প্রকাশ করে।

এ আমির আবরণ সহজে স্খলিত হয়ে যাক;
চৈতন্যের শুভ্র জ্যোতি
ভেদ করি কুহেলিকা
সত্যের অমৃত রূপ করুক প্রকাশ।'

(র-র ৩, পৃ. ৮৩৫)

রবীন্দ্রনাথ এরপরে সংস্কৃত 'ধর্ম' শব্দটির অর্থ ব্যাখ্যা করেন যা ইংরাজিতে religion বলে অনূদিত হয়। তিনি বলেন যে এই শব্দটির একটি গভীর ব্যঞ্জনা আছে। ধর্ম হচ্ছে সকল কিছুর স্বভাবধর্ম, বস্তু সকলের নির্গলিতার্থ (essence), তাদের অন্তর্নিহিত সত্য। ধর্ম হচ্ছে সেই চরম অভীষ্ট যা মানুষের মধ্যে কাজ করে।

মানুষের ধর্ম তার নিগূঢ়ার্থ কারণ তা তার সহজাত, তাকে বাহ্যত যা মনে হয় সে তা নয়। একটি বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তার প্রকৃত ধর্ম কী তা জানা যায় না। মানুষের মধ্যে যে সম্ভাবনা বীজাকারে থাকে তার বহিরাবরণ ঘুচে গিয়ে তা আধ্যাত্মিক স্বরূপে পরিণত হয়। নিজেকে নিজের ব্যক্তিসত্তার থেকে মুক্ত করে নিজের আত্মাকে জানতে পারলে অবিদ্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

আমরা যখন মুক্তিলাভ করাকে মানুষের সর্বোচ্চ আদর্শ বলে জানি তখন আমরা তার ধর্মকেই জানি, যা তার প্রকৃতির নির্যাস, ব্যক্তিসত্তার তাৎপর্য। প্রাথমিকভাবে মনে হয় তাকেই মানুষ মুক্তিলাভ বলে মনে করে যার দ্বারা সে অপর্যাপ্ত সুযোগসুবিধা লাভ করে। ইতিহাস অবশ্য বলে যে, যে-সকল মানুষের আত্মদর্শন হয়েছে তাঁরা সকলেই আত্মত্যাগের জীবনযাপন করেছেন। মানুষের উন্নত প্রকৃতি নিজের মধ্যে এমন কিছুর সন্ধান করে যা তাকে ছাড়িয়ে যায় অথচ তা হচ্ছে তার গভীরতম সত্য; যা তার সকল ত্যাগ দাবি করে হয়ে ওঠে তার পুরস্কার।

আমাদের ব্যক্তিসত্তাকে যে দুটি ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত থেকে দেখা হয় সে কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে — ১. যে ব্যক্তিসত্তা নিজেকে প্রদর্শন করে; ২. যে ব্যক্তিসত্তা নিজেকে অতিক্রম করে নিজের অর্থ প্রকাশ করে এবং নিজেকে প্রকাশ করতে নিজস্ব যা-কিছু সব ত্যাগ করে। তাই সে নির্দ্বিধায় বলে,

> আমার যে সব দিতে হবে, সে তো আমি জানি —
> আমার যত বিত্ত, প্রভু, আমার যত বাণী।।
>
> (পৃ. ১৯০)

প্রদীপ তার ভিতরে তেল ধরে রেখে নিজেকে অন্য বস্তু থেকে পৃথক রাখে কিন্তু প্রজ্জ্বলিত হলে সে সকল বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে নিজের সার্থকতা খুঁজে পায়; তার সঞ্চিত তেল ব্যয় করে শিখাটি জ্বালিয়ে রাখে।

আমাদের ব্যক্তিসত্তাকেও রবীন্দ্রনাথ একটি প্রদীপের সঙ্গে তুলনা করেছেন। যখন সে তার সংগৃহীত বস্তুকে পুঁজি করে তখন সে নিজেকে অন্ধকারের মধ্যে রাখে, নিজের আচরণ তার সত্য উদ্দেশ্যের বিরোধিতা করে। যখন তার নিজস্ব

আলোকে সে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তখন সে তার যা-কিছু আছে তা আলোকিত করে; কারণ এর ভেতর দিয়েই সে প্রকাশিত হয়। বুদ্ধ এই প্রকাশে মানবের যে মুক্তি সেই কথাই তাঁর উপদেশে বলেছেন। কোনো উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য ছাড়া তেল ব্যয় করার মধ্যে যে দীনতা রয়েছে তিনি সেভাবে ব্যয় করার কথা কখনোই বলেননি। প্রদীপ তার তেল ব্যয় করবে চতুষ্পার্শ আলোকিত করতে তা হলে তার তেল সঞ্চয় করার উদ্দেশ্য মুক্তি পায়। এ-ই হচ্ছে বন্ধনমুক্তি। বুদ্ধ যে পথটি দেখিয়েছেন তা আত্মনিগ্রহ নয়, তা প্রেমের বিস্তার। সেখানেই বুদ্ধের উপদেশের যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়।

বুদ্ধ নির্বাণ সম্বন্ধে যে ধর্মোপদেশ দেন তা হচ্ছে প্রেমের চরম পরিণতি। প্রেমেই রয়েছে প্রেমের শেষ কথা। 'প্রেমে—কেন, কী হবে, এ-সমস্ত প্রশ্ন থাকতেই পারে না। প্রেম আপনিই আপনার জবাবদিহি, আপনিই আপনার লক্ষ্য।' ("প্রেম", র-র ১২, পৃ. ১১২)।

স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায় নিঃসন্দেহে কোনো ব্যক্তিকে কিছু লাভ করার জন্য কিছু ত্যাগ করতে প্ররোচিত করে। সেই ব্যক্তি তা করতে বাধ্য হয় তাই একে গাছের ডাল থেকে কাঁচা অবস্থায় ফল তোলার সঙ্গে তুলনা করা হয়। কারণ এতে গাছের ডালটির আঘাত লাগে। কোনো মানুষ যখন অন্যকে ভালোবেসে দান করে তখন তা তার কাছে আনন্দের বিষয় হয়ে ওঠে যেমন কোনো গাছ যখন তার পাকা ফলটিকে সমর্পণ করে। যে মানুষের কোনো বস্তুর প্রতি গভীর আসক্তি থাকে তা সে সহজে বর্জন করতে পারে না। সে বলে,

> নদীতটসম কেবলই বৃথাই প্রবাহ আঁকড়ি রাখিবারে চাই,
> একে একে বুকে আঘাত করিয়া ঢেউগুলি কোথা ধায়।।
>
> (পৃ. ২৩৪)

মানুষ যখন প্রেমে আচ্ছন্ন হয়ে দান করে, সেই দান তার আনন্দের বিষয়, এ তার কোনো ক্ষতি নয়, এই দান তার স্বধর্মকে পরিপূর্ণ করে।

তাই পূর্ণ প্রেমে আমরা ব্যক্তিসত্তার স্বাধীনতা খুঁজে পাই। প্রেমে আমরা যা করি তা মুক্ত হয়েই করি তার জন্য যতই যাতনা ভোগ করি-না-কেন। প্রেমে যে কর্ম করা হয় তা হচ্ছে কর্ম প্রক্রিয়ার মধ্যে মুক্তি। গীতায় নিষ্কাম কর্ম বলতে এ কথাই বোঝায়।

রবীন্দ্রনাথ দুধরনের মুক্তির কথা বলেন, একটি নেতিবাচক অপরটি ইতিবাচক। মানুষের পক্ষে কর্মে সংযম আনা প্রয়োজন যদিও অতিরিক্তমাত্রায় কৃচ্ছ্রসাধন কর্মে সংযম আনলেও তা মানুষকে মুক্তিলাভের থেকে বঞ্চিত করে। কারণ এ-ও এক ধরনের বন্ধন। তাই কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া গেলেও এটি মুক্তির নেতিবাচক দিক কারণ এ ধরনের মুক্তিতে শারীরিক কামনা বা ভালোবাসা, ক্রোধ, উৎকণ্ঠা বা উত্তেজনাকে উপেক্ষা করা হয়। এতে নিজেকে একভাবে বঞ্চিত করা আবশ্যক হয়ে পড়ে এবং তা মুক্তির বিপরীতপন্থী হয়। মানুষের চেতনার স্তরের কোনো উত্তরণ ঘটে না কারণ মানুষ সংযমের বাঁধনে নিজেকে জড়িত করে ফেলে।

মুক্তির ইতিবাচক দিকের কথা রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন তখন তিনি মায়ের সন্তানের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ মমতার কথা বলতে চান অথবা যখন গভীর ভালোবাসা থেকে বন্ধু বন্ধুর প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় সেই কথা বলতে চান। অর্থাৎ এ ধরনের কর্ম কোনো ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যে করা হয় না। নিরাসক্ত হয়ে বা নিঃস্বার্থভাবে এই কর্ম করা হয়। মানুষের যে কর্মপ্রচেষ্টা তার চেতনার স্তরগুলিকে যুক্ত করতে সহায়তা করে তা নির্লিপ্ত ধরনের হওয়া প্রয়োজন।[১]

গীতা আরও বলে যে কর্ম আমাদের অবশ্যই করতে হবে কারণ তা আমাদের প্রকৃতিকে ব্যক্ত করে। কিন্তু কর্ম মুক্ত না হলে মানুষের এই প্রকাশ কখনোই সম্পূর্ণ হয় না। অভাব বা ভীতি থেকে যে কর্ম করতে আমরা বাধ্য হই তা আমাদের প্রকৃতিকে পরিস্ফুট করে না।

ঈশ্বরের অভিব্যক্তিও তাঁর সৃষ্টিতে এবং উপনিষদ্ বলেন 'জ্ঞান, শক্তি, কর্ম এ সবই তাঁর প্রকৃতি'; এ-সব বাইরে থেকে তাঁর উপর আরোপ করা হয় না। এই কর্মই তাঁর মুক্তি। নিজের সৃষ্টিশীলতায় তিনি নিজেকে উপলব্ধি করেন।

রবীন্দ্রনাথ বলেন যে শিল্পী সে তার শিল্পজনোচিত ভাবনাকে পূর্ণরূপ দিয়ে আনন্দলাভ করে। তিনি বলেন, 'কবি বলো, চিত্রী বলো, আপনার রচনার মধ্যে সে কী চায়? সে বিশেষকে চায়।.....মানুষের সৃষ্টি চেষ্টাও.....অনির্দিষ্ট সাধারণ থেকে সুনির্দিষ্ট বিশেষকে জাগাবার চেষ্টা। আমাদের মনের মধ্যে নানা হৃদয়াবেগ ঘুরে বেড়ায়।.....হৃদয়াবেগকে প্রকাশ করা হল বলেই যে আনন্দ তা নয়। তাকে

বিশিষ্টতা দেওয়া হল বলেই আনন্দ। সেই বিশিষ্টতার উৎকর্ষে তার উৎকর্ষ।'[২] ("পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি", র-র ১০, পৃ. ৫৮৭)। এই আনন্দই আমাদের নিজেদের থেকে বিযুক্ত করে প্রেমজাত সৃষ্টিতে রূপ দেয়। সেই সৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে অবশ্যই পৃথক হয়ে থাকতে হয়, তা বিকর্ষণ থেকে নয়, তা প্রেমই পৃথক করে। বিকর্ষণের মধ্যে যে একটি উপাদান আছে তা বিচ্ছেদ। কিন্তু প্রেমে আছে দুটি উপাদান, একটি হচ্ছে বিচ্ছেদ যা তার বাহ্যরূপ, দ্বিতীয়টি মিলনের উপাদান যা সর্বোচ্চ সত্য।

ঈশ্বর এবং অন্য সকলের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হলে ব্যক্তিসত্তার অর্থ হারিয়ে যায় যা একমাত্র খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয় অন্তহীন যোগ বা অভিন্নতা উপলব্ধির মধ্যে। তাই আমাদের দার্শনিকেরা বিচ্ছিন্নতাকে মায়া বা বিভ্রম বলেছেন, যার কোনো মৌলিক সত্যতা নেই। রবীন্দ্রনাথ অসম্পর্কিত হওয়াকে বিপজ্জনক বলে মনে করেন কারণ তা অস্তিত্বকে ম্লান করে তোলে। বাহ্যত এর হঠাৎ-বিদ্রোহী, ধ্বংসাত্মক রূপ ধরা পড়ে। এ যেন অহংকারী, উদ্ধত, অনমনীয়। পৃথিবীর সব ঐশ্বর্যকে অপহরণ করে মানুষের ক্ষণিক আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করতে প্রস্তুত। যথার্থই মানুষের ইতিহাসে দেখা যায় ব্যক্তিসত্তার এই বিচ্ছিন্নতা মানুষের ভাগ্যে চিরকালের জন্যে ঔদ্ধত্যের কালিমা লেপে দিয়েছে। যদিও এ সবই মায়া, অবিদ্যার দ্বারা আচ্ছাদিত। এ যেন কুয়াশা, সূর্যালোক নয়। এ এক কৃষ্ণবর্ণের ধোঁয়া যা প্রেমাগ্নির পূর্বাভাস।

অবিদ্যা ব্যক্তিসত্তাকে বিচ্ছিন্নতার দ্বারা অমূল্য মনে করে এবং মানুষ সেই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তাকে মূল্যহীন করে উপস্থাপিত করে। অবিদ্যা ঘুচে গেলে ব্যক্তিসত্তা তার অমূল্য সম্পদ নিয়ে আবির্ভূত হয়। কবির সংগীতে এ আশ্বাস পাওয়া যায় —

'এ আবরণ ক্ষয় হবে গো ক্ষয় হবে,
এ দেহমন ভূমানন্দময় হবে।।'

(পৃ. ৮৫)

রবীন্দ্রনাথ কর্মের আলোচনায় আবার ফিরে আসেন। যে কর্ম মানুষ শুধুমাত্র প্রয়োজনের কারণে করতে বাধ্য হয় তা হয়তো সাময়িকভাবে আবশ্যক যদিও আবার প্রয়োজনে তাকে বর্জন করা যেতে পারে। কিন্তু আনন্দ থেকে যে কর্ম

উৎপন্ন হয় এবং যে রূপ সে গ্রহণ করে তাতে অমরত্বের উপাদান থাকে। মানুষের মধ্যে যে চিরন্তনতা তা এই রূপগুলিতে তার নিত্যতার গুণ দান করে। আমাদের ব্যক্তিসত্তা যা ঈশ্বরের আনন্দের একটি রূপ তা অবিনশ্বর। কারণ তাঁর আনন্দ অমৃতম্, তা চিরন্তন। আমাদের মধ্যে অমরত্ব সম্বন্ধে এই বোধ থাকায় আমরা মৃত্যু সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হয়ে পড়ি যদিও মৃত্যুর বাস্তবতাকে সন্দেহ করতে পারি না। নিজেদের মধ্যে এই বিপরীতভাবকে মিলিয়ে দিয়ে আমরা এই সত্যে উপনীত হই যে জীবন-মৃত্যুর এই দ্বৈততার মধ্যে রয়েছে সামঞ্জস্য। আত্মার জীবনে রয়েছে সীমার প্রকাশ এবং তার মূলতত্ত্ব রয়েছে অসীমে তাই মৃত্যুর দরজা না পেরোতে পারলে জীবন অসীমকে উপলব্ধি করতে পারবে না। মৃত্যু অদ্বিতীয় তার মধ্যে প্রাণ নেই। প্রাণের মধ্যে রয়েছে দ্বিত্ব, তার বাহ্যরূপ ছাড়াও রয়েছে তার সত্যতা; মৃত্যু তার বাহ্যরূপ বা মায়া যা জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। আমাদের সত্তাকে প্রাণময় থাকতে হলে ক্রমাগত পরিবর্তন ও রূপের বিকাশের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। আমরা যখন সত্তাকে কোনো পরিবর্তনহীন আকার দিতে চাই বা সত্তা যখন নিজেকে ছাড়িয়ে যাবার কোনো প্রেরণা পায় না তখনই আমাদের মৃত্যু ঘটে। আমাদের গুরু এই মৃত্যুর কাছেই মরতে ডাকেন; অনন্ত জীবন লাভ করবার জন্য এ ডাক, এ ডাক ধ্বংসের জন্য নয়।

'মুকুট' নাটকে যুবরাজ ও সেনাপতি ঈশা খাঁ-র মধ্যে যে কথোপকথন হয় সেখানে ঈশা খাঁ যুবরাজকে বলেন, 'নইলে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু তো বিবাহশয্যায় নিদ্রা।' (র-র ৬, পৃ. ২৩৭)। এই মৃত্যুর কথাই রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা'-র চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করেন। মানুষ যখন তার আপন সত্তার কোনো উন্নতি সাধন করার চেষ্টা করে না তখনই তার মৃত্যু ঘটে। যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মতো মৃত্যু বরণ না করে মানুষ যখন প্রাণভয়ে ভীত হয়ে তা এড়াতে চায় তাতেই সে মৃত্যুকে ডেকে আনে। ঈশা খাঁ-র সংলাপে দেখি যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুই হচ্ছে বাসর শয়নে নিদ্রার সঙ্গে তুলনীয় তাই তা বরণীয় কারণ মানুষ সেখানে মৃত্যুকে গুরুত্ব দেয় না। যুদ্ধক্ষেত্রের মতো কোনো প্রতিকূল পরিবেশে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে মানুষ যখন তার জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে তখনই সে অমরত্ব লাভ করে বা অনন্ত জীবনের অধিকারী হয়। এ মানুষের অন্তরতম বাসনা এবং একেই সে রূপ দিতে চায়।

রবীন্দ্রনাথ মানুষের বাসনা সম্বন্ধে বলেন যে তার অস্তিত্বে দু'ধরনের বাসনা আছে যাদের মধ্যে সামঞ্জস্য আনার প্রচেষ্টা করার প্রয়োজন। মনুষ্য জীবনকে তিনি তিনটি প্রেক্ষিত থেকে দেখেন।

ক. শারীরিক জীবন

খ. সামাজিক জীবন

গ. ব্যক্তিসত্তা

ক. মানুষের শারীরিক প্রকৃতিতে কিছু বাসনা লক্ষ করা যায় যার সম্বন্ধে সে সচেতন। সে খাদ্য ও পানীয় উপভোগ করতে চায় ও নানা ধরনের দৈহিক আরাম ও আনন্দ কামনা করে। এই বাসনাগুলি একান্ত ব্যক্তিগত, আপন তাড়নায় এরা জাগ্রত হয় তবে মানুষ এদের বিষয়ে সংযমী না হলে এদের থেকে বিপদ হতে পারে।

মানুষ তার শরীরে আর এক ধরনের বাসনা সম্বন্ধে সচেতন নয়, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়ার ইচ্ছা তেমনই একটি বাসনা যা কোনো তাৎক্ষণিক ইচ্ছা পূরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এবং বর্তমানকে ছাড়িয়ে যায়। যে ব্যক্তি জ্ঞানী সে শরীর রক্ষার এই মূল নীতির সঙ্গে অন্য শারীরিক বাসনার সামঞ্জস্য রক্ষা করে।

খ. মানুষের সামাজিক জীবনকে একটি জীবসত্তার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে এবং আমরা আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা নিয়ে তার যন্ত্রাংশ হয়ে উঠি। আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা এবং আনন্দ লাভ করতে চাই, আমাদের লক্ষ্য হয়ে ওঠে অল্প কিছু দিয়ে অধিক লাভ করা। এ সকল ঘটনা মানুষে মানুষে হানাহানির কারণ হয়ে ওঠে। কিন্তু সামাজিক প্রাণী হিসাবে আমাদের মনের গভীরে দ্বিতীয় যে ইচ্ছা কাজ করে তা সমাজের কল্যাণ চায়, তা আমাদের ব্যক্তিগত এবং যা-কিছু বর্তমান তাকে ছাড়িয়ে যেতে চায়।

যে জ্ঞানী সে তার ব্যক্তিগত ইচ্ছার সঙ্গে সমাজের কল্যাণ কামনার মধ্যে সামঞ্জস্য এনে তার উচ্চতম ব্যক্তিসত্তাকে উপলব্ধি করে।

গ. মানুষের ব্যক্তিসত্তা যখন সীমিত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নিজের বিচ্ছিন্নতা সম্বন্ধে সচেতন হয় তখন সে তার নিজস্বতাকে কঠোরভাবে রক্ষা করতে চায়। কিন্তু অসীমের পরিপ্রেক্ষিত থেকে তার ইচ্ছা হয় সামঞ্জস্য লাভ করার যা তার শক্তিসম্পদ বৃদ্ধি না করে তাকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।